এক অবার্চীন ভারতীয়র চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

-বিপ্লব

একাত্তরে আমার জন্ম হয় নি। তবে ছোটবেলায় যখন বড় হচ্ছি, অনেক প্রতিবেশীর কাছেই জয় বাংলার টাটকা জলচ্ছবি। সেদিনকার ঘটনা।

যখানে বড় হয়েছি, সেখানে ছড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের অজস্র ছোট খাট ঘটনা। কোনটা ঠিক, বেঠিক জানি না। তবে রূপকথার মতোই মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলি সত্যি বলেই চলে আসছে।

ছেলেবেলা কেটেছে- নদীয়ার উত্তরপ্রান্তের এক ছোট শহরে। মুজিবনগর সরকার তৈরী হয়েছিল মেহেরপুরে। আমার বাড়ী থেকে বেশ কাছে। সুতরাং আমার বাড়ীর কাছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।

বাড়ীর সামনে খরে নদী। সেখানকার চরে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া হত বলে শুনেছি। সেখানে কিছু পাকি চরের আনাগোনা থাকবে না সে কি হয়! আমার প্রতিবেশী মন্ডলদের তিনতলার এক চিলে কোঠা থেকে চরার ওপর নজর রাখা ছিল সহজ। ঘটনাক্রমে সেখানেই থাকত এক পাকি চর। তার গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় এক সন্দেহবাতিক কাকু কাছের মিলিটারী ইউনিটে রিপোর্ট করে। এবং আধ ঘন্টার মধ্যেই হিন্দি সিনেমার কায়দায় তার কাছ থেকে রেডিও ইকুইপমেন্ট উদ্ধার। শোনা যায় মুক্তিবাহিনীদের দিয়ে নদীর চরেই তাদের অর্ধেক পুঁতে শুট করা হয়।

একটা ব্যাপার আমরা সবাই ভুলে যাই। সেটা হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধের সত্যিকারের নায়ক ইন্ডিয়ান আর্মি কর্পের ইঞ্জিনিয়াররা। তথ্য নথি ঘেঁটে যেটুকু জানি, নিয়াজি জানতেন, পাকিস্থানের পক্ষে যুদ্ধটা হচ্ছে ঢিলে দিতে পারলেই বেঁচে যাই টাইপের। প্রস্তুতিও ছিল যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার জন্য। জেনারেল আরোরা নিজেও ভাবতেন, বড়জোর চট্টগ্রাম, খুলনা দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হবে। কিছু দরদাম করা যাবে। মধ্যে এসে ইউ এন, যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। রাশিয়াও বলে পাঠিয়েছিল বেশীদিন ভেটো দিয়ে আটকানো যাবে না। একমাত্র জেনারেল জ্যাকব ভাবেছিলেন অন্য রকম। উনিই প্রথম ভাবেন, আর্মিকপ ইঞ্জিনিয়ারা যত দ্রুত ব্রীজ বানাতে পারবে বা সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তত দ্রুত হবে অগ্রগতি। এর একটা নমুনা বাড়ীর পাশেই দেখেছি। ইন্ডিয়ান আর্মিকে শিকারপুর বর্ডার দিয়ে ঢুকতে হলে, মাথাভাঙা ওপর একটা কাঠের ব্রীজ অতিক্রম করতে হতো। ট্যাঙ্কতো সেই রাস্তায় যাবে না। ব্রীজটা পাকা করতে হত। শুনেছি মাত্র চারদিনেই সেই কাজ করে আর্মি কর্প- ব্রীজটি এখনো আছে। পাশে কাঠের ব্রীজটিও রয়েছে। প্রায় তিনশো ফুট লম্বা ব্রীজটি ছোট খাট কিছু নয়। সেই ব্রীজ আজ ৩৫ বছর পরেও সম্পুর্ন সুস্থ এবং অক্ষত আছে (প্রতিদিন শত শত বাস এবং ট্রাক যাচ্ছে)। এটা দেখলেই আশ্চর্য হই। এই রকম মানের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে, যুদ্ধ কতদিন গড়াত বা কি হত বলা মুশকিল।

যুদ্ধ কি রকম হয়েছিল ? সেই গল্প শুনেছি প্রতিবেশী এক প্রাক্তন সেনানায়কের কাছে। তিনি এই প্রশ্ন শুনলেই হাঁসেন! বলেন, আরে ভাই যুদ্ধটা কোথায় করলাম! একটাই তো কাজ ছিল। পাকিস্থানী সেনারা যুদ্ধ করত মুক্তিবাহিনীর সাথে। ইন্ডিয়ানরা যেই আসত, সাদা পতাকা উড়িয়ে দিত। মানে যুদ্ধ করত, যাতে মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা না যায়। একবারই মাত্র একটা স্কুল থেকে কিছু মেশিনগানের আওয়াজ আসে। উনার জেনারেল হেঁসে বলেছিলেন, নিশ্চয় তাদের মুক্তিবাহিনী ঠাওরেছে। সেই জন্য ট্যাঙ্ক থেকে শুন্যে কতগুলো কামান, মর্টার দেগে দিলেন। যাতে বোঝা যায় ইন্ডিয়ান আর্মি চলে এসেছে। ব্যাস সাদা পতাকাও উড়ে গেল! ভারতীয় দৃস্টিভংগীতে এই ছিল যুদ্ধ!

বাংলাদেশে ১৬ই ডিসেম্বরকে কি চোখে দেখা হয়, সেটা প্রথম বুঝলাম ১৯৮৪ সালে। যখন রাজশাহী টিভি রিলে সেন্টার থেকে বিটিভি আসা শুরু হল। তখন বাংলা অনুষ্ঠান বলতে শুধু বিটিভি, কারণ '৮৬ সাল পর্যন্ত বহরমপুর রিলে সেন্টার হয় নি। দূরদর্শন ঠিকঠাক আসত না। কলকাতায় মাত্র তিন ঘন্টা বাংলা অনুষ্ঠান।

১৬ ই ডিসেম্বরের বিজয়দিবস বলতে তখন বিটিভিতে শুধুই এরশাদের মুখ। এরশাদের বালখিল্য কবিতা। ভারতের সব পত্রিকাতেই ১৬ ই ডিসেম্বর মুজিবের একটা অন্তত ছবি দেখা যেত। অথচ বিটিভিতে মুজিব, আওয়ামী লীগ , জিয়াউর রহমান বা ভারত স্পিকটি নট। সেখানে শুধু ই এরশাদ, আর এরশাদ। তার বৌ। মাই তার চাকরটা পর্যন্ত! এমনকি সিনেমাতে মুজিবের নাম এলে সাইলেন্ট করে দেওয়া হত (সেখানে এরশাদের নামটা বলা বাকী ছিল!)। ভাবটা এমন এরশাদ নামক এক কবি , কবিতা লিখেই বাংলাদেশে স্বাধীনতা এনেছে! ভারতের যে একটা রোল ছিল, সেটা বিটিভিতে কখনোই উচ্চারিত হয় নি। এই অকৃতজ্ঞতায় এপারের লোকজন হতাশ। হিন্দুত্ববাদীরা বলত বেইমানের জাত। বামপন্থী ধর্মনিরেপেক্ষরা বলত জাতির জনকেরই বোকা বাক্সে ঠাঁই নাই। তো ভারত!

নব্বইয়ের দশক। কেবল আসে নি। দূরদর্শনের হিন্দির চাপে বাংলার নাভিশ্বাস উঠেছে। কিছু এপারের বাংলাপাগল এরশাদের মধ্যে খুঁজে পেতো বাঙালীত্ব! ব্যাপারটা এমন, বাংলাদেশের লোক খেতে পেলো না তো কি হল! একটা স্বাধীনদেশের ভাষা বাঙলা, এটাই বা কম পাওনা কি! উপরি পাওনা এক রাস্ট্রনায়ক বাঙালী কবি! আমি অবশ্য অতটা বাঙালী হতে পারি নি। তাই এরশাদকে ভাঁড়ের বেশী কিছু মনে হয় নি।

যাই হোক বাড়ী ছেরে হোস্টেলে যাওয়ার পর, বাংলাদেশ আমার র‍্যাডার থেকে আউট অনেক দিন। আই আই টি তে বেশ কিছু বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রী (প্রায় শ খানেক), সাড়ম্বরে ভাষা দিবস পালন করে। সামিল হয় এপার বাংলার আরো শখানেক ছাত্র-ছাত্রী। ওই একটা দিন বাঙালীর মন, বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর দেহ এক হয়ে যায় রবীন্দ্রনজরুল সংগীতে।

আপাতত বাংলাদেশের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মুক্তিযুদ্ধে জিতে কি লাভ হলো

বুঝতে পারছি না। ইসলামের মধ্যে দিয়ে সেই আরবীসংস্কৃতিই তো ফিরে আসছে!

রবীন্দ্রনাথের কথা বড়ই মনে পড়ছে! সংখ্যাগরিষ্ঠ এক বিরাট অংশকে আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে পেছনে ফেলে রাখলে, বামপন্থা বা ডানপন্থা সবটাই অসার। ফ্যাসিজম সময়ের অপেক্ষা মাত্র!

১২/১৫/০৫